আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

নজরুল ইসলাম

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা নিয়ে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। এই শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যে দল ক্ষমতায় আসেন তারা নতুন করে সিলেবাস, পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করে বিভিন্ন সার্কুলার জারি করেন। আসলে এই স্তরে হচ্ছেটা কি? এর প্রকৃত তথ্য সরকারের কাছে নেই। আমি এ পেশার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে যে অবস্থা অনুধাবন করতে পারি সে তুলনায় কোন বিশেষজ্ঞ রাজধানীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে চেয়ারে বসে সামান্যতম অবস্থা বুঝতেও পারেন না। কেননা বাস্তব ময়দানে কাজ করার অভিজ্ঞতা আর রুমে বসে নির্দেশনা দেয়া এক জিনিস নয়।

এ পর্যায়ে আমার আলোচনাকে দুইভাগে বিভক্ত করে অগ্রসর হব। প্রথমে আসি শিক্ষাদানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বেতন কাঠামোতে। একজন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীধারী ব্যক্তি সরকারী অনুদানভুক্ত হলে জাতীয় বেতন কাঠামো ২,৫৫০ টাকা স্কেলের শতকরা ৮০ ভাগ পান। সেটা আবার অনিয়মিত। আর 'বিএড' প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে ৩,৪০০ টাকা স্কেলের শতকরা ৮০ ভাগ। এই দুর্মূল্যের বাজারে সামান্য টাকা দিয়ে শিক্ষকদের কিভাবে সংসার চলে সেটা ভুক্তভোগী শিক্ষকই জানেন। অন্যদিকে সরকারী চাকুরীজীবীরা ঐ একই স্কেলে মূল বেতনসহ বাড়ী ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা পান এবং সে সঙ্গে প্রতি বছর তাদের ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা আছে তৎসহ চাকুরী শেষে মোটা অংকের অর্থ পান। এ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক সারা জীবন জ্ঞানের আলো বিতরণ করে খালি হাতে বাসায় ফিরে দুর্বিষহ জীবনযাপন করেন। বছরে দু'টি ঈদ উৎসবে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ শিল্প কারখানার শ্রমিকেরাও বোনাস পেয়ে থাকেন অথচ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোন বোনাস নেই। ঘটনার আড়ালে আরো মজার ব্যাপার আছে। একজন 'আনট্রেইন্ড' শিক্ষক বিএড প্রশিক্ষণ লাভের পর এবং ন্যূনতম আট বছর চাকুরীর পর বেতন বৃদ্ধির একটা সুযোগ আছে। যথারীতি কাগজপত্র তৈরী করে জেলা শিক্ষা অফিস এবং ডিজি অফিস পার করতে প্রার্থীকে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খোওয়াতে হয়। অর্থাৎ একজন শিক্ষক তার বৈধ অধিকার পেতে হলে জেলা শিক্ষা অফিসার ও ডিজি অফিসে তাকে টাকা দিতেই হবে। বিষয়টি সকলের জানা। অথচ প্রতিকারের কেউ নেই। বেচারা শিক্ষকের ঘরে চাল থাকুক আর নাই থাকুক, ছেলে-মেয়েদের অনাহারে রেখে ঘুষের টাকা জোগার করতে হয়। কি বিচিত্র দেশ! বৈধ পাওনা নিতে গিয়ে ঘুষ দিতে হয় উপরওয়ালাদের।

কথা উঠেছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন সাধারণ 'ট্রেইন্ড' শিক্ষক যে বেতন পান একজন সদ্য যোগদানকারী অনার্স বা মাস্টার্স পাস শিক্ষক তার চেয়ে কম বেতন পান। এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বেশী শিক্ষা লাভ করে বেশী বেতন পাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে কাঠামো অনুযায়ী গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীই যথেষ্ট। দেশে বেকার সমস্যা প্রকট হওয়াই অনার্স এবং মাস্টার্স পাস করা ব্যক্তিরা চাকুরী না পেয়ে এ পেশায় আসছে। তাহলে কেন এই বেতন বৈষম্যের জিজ্ঞাসা? আসলে সরকারী নীতিমালায় রয়েছে গলদ। আমার মতে, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকতার বেতন স্কেল একটাই থাকা উচিত অর্থাৎ ৩,৪০০ টাকা এবং চাকুরীতে নিয়োগ দানের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা উচিত। প্রশিক্ষণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে হলে সে ক্ষেত্রে অনন্য ৫ বছরের মধ্যে তাকে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করতে হবে এমন শর্ত যুক্ত থাকা দরকার। সমস্যা হতে পারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতা নিয়ে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রকল্প নিয়েছে তাতে আগামী ১০/১২ বছরের মধ্যে এ সমস্যা সমাধান হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এবার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করা যাক। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয় পরিচালনা কমিটি শিক্ষক নিয়োগ বা অপসারণের সর্বময় কর্তা। এমন দেখা গেছে, একযুগ দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষকতা করার পর কমিটি বা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় হঠাৎ করে চাকুরী থেকে অপসারণ করা হয়। এ ব্যবস্থা বিলোপ করা দরকার। এখানে শিক্ষককে পেশার প্রতি যত্নবান না হয়ে কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের মন যুগিয়ে চলতে হয়। অন্যদিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে চলছে এখন 'ডোনেশন' নামের তেলেসমাতি। মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে হয়ে অনেক কষ্ট, অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে ডিগ্রী নেবার পর চাকুরী নিতে এসে আশি হাজার থেকে এক লাখ টাকা ডোনেশন দিতে হচ্ছে। বেচারা বেকার সন্তান। লেখাপড়া শিখেছে কিছু একটা করার জন্য। কিন্তু চাকুরীর দুয়ার বন্ধ। বেকারত্বের গ্লানী ঘোচানোর জন্য জায়গা জমি বিক্রি করে ডোনেশন সংগ্রহ করে চাকুরী নিতে হয়। মোটা অঙ্কের ডোনেশন দেয়ার পর আবার জেলা শিক্ষা অফিসার ও ডিজি অফিসে ন্যূনতম পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। এ যদি হয় চাকুরী গ্রহণের প্রক্রিয়া তবে বেচারা কেন প্রাইভেট পড়িয়ে টাকা কামাই করবে না।

এবার আসি শিক্ষার মান উন্নয়নের কথায়, শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের প্রধান থেকে প্রতিমন্ত্রী সকলেই গালভরা বক্তৃতা অহরহ করেন। বাজেট পেশের পর শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় ধরা হয়েছে এটা একটা রুটিন বক্তৃতা। অবশ্য সকল মন্ত্রী নিজ নিজ মন্ত্রণালয় সম্পর্কে ঐ একই কথা বলেন। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষার মান কোথায় গিয়ে ঠেকেছে এবং কেন ঠেকেছে এটা কোন বিশেষজ্ঞের বক্তৃতায় পেলেও আসল তথ্য কেউ বলতে পারেন না। কারণ পূর্বেই বলেছি রাজধানীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে হাজার হাজার টাকা গবেষণার নামে আত্মস্থ করে এসব বিষয় জানা যায় না।

বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে শুধুমাত্র ৯ম/১০ম শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞান নিয়ে কিছু আলোকপাত করা যাক। বর্তমান সিলেবাসভুক্ত রসায়ন পুস্তকে ১৫টি অধ্যায় রয়েছে। এসব অধ্যায় ইতিপূর্বে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে এবং কিছু অংশ বিএসসিতে পড়ানো হত।

নির্বাচিত অনুচ্ছেদগুলোর পরিধি ব্যাপক বিস্তৃত। রুটিন অনুযায়ী সপ্তাহে দুই অথবা তিন দিন রসায়ন ক্লাস করতে হয়। সপ্তাহে দুই দিন অথবা তিন দিন ক্লাস নিয়ে ২ বছরে পুস্তকটির কতটুকু অংশ শেষ করা যাবে এ ব্যাপারে সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি চিন্তা-ভাবনা করেননি। একজন বিএসসি শিক্ষককে সপ্তাহে ৩০-৩২টি ক্লাস নিতে হয়। তাকে বিভিন্ন ক্লাসে অংক, বিজ্ঞানসহ রসায়ন পড়াতে হয়। অর্থাৎ দিনে তাঁকে ৫-৬টি ক্লাস নিয়মিত করতে হয়। প্রতিটি ক্লাসে ৫০ থেকে ৬০ জন শিক্ষার্থী। হাই স্কুল পর্যায়ে বাসার কাজ আদায়ের সামান্য পরিশ্রম করতে হয়, সময় সর্বোচ্চ ৪০ মিনিট। ক্লাসে প্রবেশ করে শৃঙ্খলা ফিরে আনা, বাসার কাজ আদায়, বিষয় বুঝানো ইত্যাদিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর পেছনে গড়ে এক মিনিট সময় বরাদ্দ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বছরে দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকে। ফলে সিলেবাস শেষ করার আগেই এসএসসি পরীক্ষা চলে আসে। কলেজে বিষয়গুলো পড়াতে শিক্ষকগণ সপ্তাহে ৫/৬টি ক্লাস নিতেন, অথচ স্কুলের একজন বিএসসি শিক্ষককে প্রতিদিন ৫/৬টি ক্লাস নিতে হয়। তাতে শিক্ষকের Energy কতটুকু থাকে সেটার চিন্তা বিষেশজ্ঞগণ করেননি। এছাড়া উক্ত অনুচ্ছেদগুলো পড়ানোর মত ভৌত কাঠামো, উপকরণ স্কুলে আছে কিনা সেটাও ভাবা হয়নি। একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রধান কাজ হল বিষয় অধ্যয়ন করে ক্লাসে প্রবেশ করা। এতগুলো ক্লাসের জন্য নিয়মিত অধ্যয়ন করা কি কোন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব? সমস্যা অনুধাবন করার জন্য একটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করলাম। শিক্ষকের আছে আর্থিক সংকট। সামান্য বেতন তাও আবার অনিয়মিত। এই সংকট মোকাবিলার জন্য তাকে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে তারা প্রাইভেট পড়াতে বাধ্য হয়। আমি প্রাইভেট পড়ানোর পক্ষে সাফাই গাচ্ছি না। সরকারী চাকুরীজীবীরা ঘুষ খায়। এটা ওপেন সিক্রেট। ডাক্তাররা প্রথম গ্রেডে বেতন পান তার পরেও তারা প্রাইভেট ক্লিনিক চালান। তাদের জন্য এটা বৈধ হলে প্রাইভেট পড়ানো অবৈধ হবে কেন? আমার কথা হলো উপযুক্ত বেতন-ভাতা দিয়ে প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করা হোক।

একটি সমস্যা যদি শুরুতেই উপড়ে ফেলা না যায় তাহলে সেটা ডালপালা বিস্তার করে বিরাট মহীরুহ আকার ধারণ করে। এরই ফলস্বরূপ আজকে কোচিং সেন্টার, নকল প্রবণতার ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। প্রশ্ন উঠবে এত টাকা কিভাবে দেয়া যাবে? সঙ্গত কারণে কিছু রাজনৈতিক কথা বলা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে পিতা, স্বামী, নেতার কবর পূজায় যত টাকা ব্যয় করা হয় পৃথিবীর কোন দেশে এ নজির নেই। কোটি কোটি টাকা খরচ করে পিতার কবর পাকা করা, স্বামীর কবর পাকা করা, স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, আগুন পূজা, অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ, মূর্তি তৈরী, নামকরণে যত টাকা শ্রাদ্ধ করা হয় তার অল্প অংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করলে এ সংকট থাকতো না। একথা শুনবে কে? ক্ষমতায় যারাই যান, তারা নিজেদের নেতা ও দলকে চিরঞ্জিব করে রাখার জন্য কাড়ি কাড়ি টাকা বিনিয়োগ করেন। অথচ জাতির মেরুদণ্ড তৈরীর কারখানায় সামান্য টাকা খরচ করতে তাদের ওজর-আপত্তির শেষ নেই।

শিক্ষার্থীর নৈতিক মান কি পরিমাণ উন্নতি, অবনতি হচ্ছে সে কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সংক্ষেপে বললে, এই দাঁড়ায় যে, প্রথম শ্রেণী থেকে মাস্টার ডিগ্রী পর্যন্ত কোন ক্লাসে আমরা শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র উন্নয়নের জন্য সামান্য বিষয় নির্ধারিত রেখেছি? বরং একটা শুভ্র সুন্দর সন্তানকে লম্পট, চরিত্রহীন, ঠকবাজ বানানোর যাবতীয় মাল-মসলা মজুদ রেখেছি বই পুস্তকে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে দেশের সকল জ্ঞানীগুণী বিশেষজ্ঞের কাছে আবেদন করছি, আসুন, অনর্থক অপচয় না করে, জাতির মেরুদণ্ড মজবুত করার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করি।

পাদটিকা ঃ চাকুরীজীবীদের বয়স এবং চাকুরী মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে বেতন প্রতিবছর প্রবৃদ্ধি লাভ করে, ফলে বছর শেষে একটা মানসিক পরিতৃপ্তি আছে। কিন্তু বছরের পর বছর চাকুরী করে কোন শিক্ষক বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি পান না। এটা কি তার পেশার প্রতি অসম্মানজনক আচরণ নয়?

তারিখ ... MAY 22 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩